জীবনানন্দের সাহিত্যে নিঃসঙ্গতার চেতনা

মো. শওকত হোসেন*

[**সার-সংক্ষেপ:** সাহিত্য বা যে কোন শিল্পকর্ম কোন সুনির্দিষ্ট দার্শনিকচেতনা কিংবা কোন বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে– এমন কথায় সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেন। জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতা তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রথাগত ধারা বা সুনির্দিষ্ট মতবাদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া অনুমোদন করেননি। তাঁর নিজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে অনেক মহল থেকে তত্ত্বহীনতা, দায়বদ্ধতা বা কোন নির্দিষ্ট আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাহীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হলেও তিনি এ ব্যাপারে ছিলেন নির্বিকার। কিন্তু তাই বলে তাঁর সাহিত্যকর্মে কোন দার্শনিক চেতনা ছিল না– এমনটি বলা সংগত নয়। যে কোন বড় মাপের কবি বা সাহিত্যিকের মতো তাঁর কবিতা তথা সাহিত্যকর্মেও প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু উঁচুমানের দার্শনিক ভাবনা বা বোধ। এই বোধ বা চেতনার দ্বারা আবশ্যিকভাবে সাহিত্যকর্মকে বেঁধে রাখার তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট দ্বিমত থাকলেও তিনি নিজেও এর দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে এটা বলা প্রয়োজন যে, এই বোধ বা চেতনা কোন প্রথাগত নিয়ম, মতাদর্শ অন্যের দ্বারা তৈরি কোন বিধান, নিদের্শনা কিংবা এককথায় আমদানিকৃত দার্শনিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক চেতনা নয়। বরং তিনি নিজের একান্ত ভাবনা বা বোধ দ্বারা স্বাধীনভাবে তাঁর সাহিত্যকর্মকে পরিচালিত করেছেন। আর এর মাধ্যমে তিনিও বেশ কিছু দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। জীবনানন্দের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে এবং কিছু দার্শনিক প্রবন্ধের দ্বারা তাঁর যেসকল দার্শনিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় তার মধ্যে নিঃসঙ্গতার চেতনা অন্যতম। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সমকালীন দার্শনিক ভাবনার, বিশেষকরে, অস্তিত্ববাদ, অ্যাবসার্ডইজম, ও বেশ কিছু উত্তরাধুনিক চিন্তায়ও নিঃসঙ্গতার বোধ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতার চেতনা ঐসকল দার্শনিক চেতনার সাথে কতটুকু সম্পর্কিত, বা স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ তা পর্যালোচনা করাই বর্তমান শিরোনামের গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য। বাঙালির দর্শন-ভাবনার ঐতিহ্য অনুধাবন ও অগ্রগতিতে এই গবেষণা গুরুত্ব বহন করবে বলে আশা পোষণ করছি।]

জীবনানন্দ দাশের কবিতা গল্প-উপন্যাস তথা সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে নিঃসঙ্গতার চেতনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিঃসঙ্গতার বিষয়টি সমকালীন দার্শনিক চিন্তা-চেতনার এক বিরাট

* **ড. মো. শওকত হোসেন:** অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

স্থান দখল করে আছে। সাহিত্য হচ্ছে মানব-চেতনা প্রকাশের একটি প্রধানতম মাধ্যম। মানুষের যে কোন প্রকাশিত বোধ, চেতনা বা মতাদর্শ যখন ভাষায় প্রকাশিত হয় তাকে ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের শ্রেণিভুক্ত বলা চলে। দার্শনকি ভাবনা প্রকাশের এক নিজস্ব ধরন রয়েছে একাডেমিক পরিমণ্ডলের দার্শনিকদের মধ্যে। কোন অলঙ্কার-উপমা দ্বারা রসাত্মক উপস্থাপনার বদলে একাডেমিক দার্শনিকগণ গুরুত্ব দেন যুক্তি-তর্ক তথা এক বিশেষ ধরনের মননশীল প্রমাণের মাধ্যমে তাঁদের মত বা তত্ত্ব প্রকাশ করতে। প্রকাশের নান্দনিকতার বদলে বক্তব্যের যৌক্তিক যথার্থতা ও সুস্পষ্টতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন পেশাদার দার্শনিকগণ। তবে এর পাশাপাশি খোদ দার্শনিকদের মধ্যেও একশ্রেণির দার্শনিক রয়েছেন যারা সাহিত্যিক পদ্ধতিতে তাঁদের দর্শন প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ একেবারে কাবিতা– গল্প-উপন্যাস তথা সাহিত্যের সংকীর্ণ সংজ্ঞার দ্বারা নির্ধারিত সাহিত্যকর্মের মাধ্যমেই তাঁদের দার্শনিক চেতনা প্রকাশ করেছেন। ভুবন বিখ্যাত গ্রিক দার্শনকি প্লেটো ডায়ালগ পদ্ধতিকে দর্শনচর্চার সবচেয়ে উত্তম উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ডায়ালগ বা কথোপকথন পদ্ধতিতেই তাঁর প্রায় সমগ্র দার্শনিক রচনা প্রকাশ করেছেন। এই পদ্ধতি এক উত্তম রকমের সাহিত্যিক পদ্ধতি। এমনকি প্লেটো নিজেও ডায়ালগ পদ্ধতিকে সর্বোত্তম রিপোরিক পদ্ধতি বলে মনে করতেন। প্লেটোর পূর্বে পারমেনাইডিস কবিতা আকারে তাঁর দর্শন প্রকাশ করেছেন। সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে নীট্শে, জ্যাঁ. পল. সার্ত, আলবেয়র ক্যামুসহ খোদ সাহিত্যের মাধ্যমেই তাঁদের দার্শনিক চেতনা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে সাহিত্যিকদের কেউ কেউ তাঁদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে কেবল রসাত্মক বিনোদন বা অন্যকোন উদ্দেশ্য অর্জন করা ছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভাবনা প্রকাশ করেছেন। আমরা যাঁদের বড়-মাপের কবি-সাহিত্যিক বলে থাকি, তাঁদের প্রায় সকলেই সুনির্দিষ্ট কিছু চেতনার প্রকাশ করেছেন, অথবা চিন্তার অনুসঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। জীবনানন্দ দাশ একজন বড় মাপের কবি। তাঁর রচনাসমূহ তথা সাহিত্যকর্মেও বেশ কিছু দার্শনিক চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে নিঃসঙ্গতার চেতনা অন্যতম।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিঃসঙ্গতার চেতনা সমকালীন দার্শনিক ভাবনায় এক প্রভাশালী স্থান দখল করে আছে। অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসঙ্গতার ধারণা, অ্যাবসার্ড ধরনের নিঃসঙ্গতার বোধ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, জীবনের একঘেমিতা (boredom), সমাজ সভ্যতার পরিবর্তন জনিত বিতৃষ্ণা থেকে নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি নানা ধরনের নিঃসঙ্গতা সমকালীন ভাবনায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই সকল নিঃসঙ্গতার দার্শনিক চেতনা কেবল পেশাদার দার্শনিকদের ভাবনায়ই প্রকাশ পায়নি, অনেক কবি-সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হয়েছে। জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতার চেতনাকে ঐসকল দার্শনিক চেতনার সাথে সম্পর্কিত করে দেখার চেষ্টা করা যায়। তবে সার্বিক বিচারে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তাঁর এই নিঃসঙ্গতার চেতনাকে প্রচলিত কোন

বিশেষ মতাদর্শগত ছকে আবদ্ধ করে দেখা চলে না। এই গবেষণায় আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ঐসকল মতের প্রায় সবগুলোর সাথে তার ভাবনার মিল থাকলেও তাঁর চেতনার স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই বিশিষ্টতাকে কোনো বিশেষ নামে চিহ্নিত করা যেতে পারে, আবার একাধিক নামেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। তাঁর মতাদর্শ কোনো বিশেষ মতাদর্শের সাথে মিললেও একেবারে মিশে যায়নি। অন্যদিক থেকে তিনি নিজেও তাঁর সামগ্রিক চিন্তায় কোনো বিশেষ মত প্রতিষ্ঠা করার কাজেও একনিষ্ঠ ছিলেন এমন বলা চলে না। কিন্তু মতাদর্শ বেরিয়ে এসেছে, যেগুলোকে আলাদা আলাদা দার্শনিক মোড়কে আবদ্ধ করা যায়। তবে এই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নিঃসঙ্গতার ধারণা বা একাকিত্বের চেতনা প্রকাশিত হয়েছে, যাকে ইংরেজিকে "solitude" বলে আখ্যায়িত করলে অনেক সঠিক অনুবাদ করা হবে বলে মনে করি।

জীবনানন্দ দাশের নিঃসঙ্গতার চেতনার ধরন ও উৎস বোঝার জন্য আমি এই আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করতে চাই। এই বিভাগগুলো হচ্ছেঃ ১. বৌদ্ধিক নিঃসঙ্গতা, ২. অস্তিত্ববাদী নিঃসঙ্গতা, ৩. মানবজীবনের প্রতি নেতিবাচক ধারণা সংক্রান্ত নিঃসঙ্গতা, ৪. ব্যক্তিজীবনের অবস্থাজনিত নিঃসঙ্গতা। এই বিভাগগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি হচ্ছে দার্শনিক-চেতনা এবং শেষোক্তটি হচ্ছে সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক।

এক

জীবনানন্দ দাশের নিঃসঙ্গতার চেতনা বিশ্লেষণে প্রথমেই আলোচনা করছি তার বৌদ্ধিক নিঃসঙ্গতা বিষয়ে। বৌদ্ধক নিঃসঙ্গতা (Intellectual solitude) বলতে আমি এমন এক ধরনের নিঃসঙ্গতাকে বোঝাচ্ছি যে নিঃসঙ্গতা বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সাথে সম্পর্কিত। মানুষ যখন বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় তখন কোনো বিচ্ছিন্নতা বা একা হয়ে যাবার চেতনা যদি এসে যায়, তাহলে সেই বোধ বা চেতনাবে বৌদ্ধিক নিঃসঙ্গতা বলা যায়। এ্যারিস্টটল মানুষকে সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে, "মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" (Aristotole, 2000 : 1.13| মানুষকে বৌদ্ধিক জীব হিসেবে যদি সংজ্ঞায়িত করা হয় (এ্যারিস্টটল যেমনটি করেছেন) তাহলে একথা অনেকটা মেনে নিতে হয় যে, সব মানুষই বুদ্ধিবৃত্তির ধারক। কিন্তু এখানে প্রশ্ন করা চলে: সব মানুষই কি একই রকম বুদ্ধির ধারক, অথবা সকলের বৌদ্ধিক চেতনা এমনকি বুদ্ধি ব্যবহারের ক্ষেত্র উদ্দেশ্য বা ফল কি এক? এসব প্রশ্নের সাদামাটা উত্তর হচ্ছে 'না'। কিন্তু তবুও এই গুণটিকে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি বা rationality-কে মানুষের বিভেদক লক্ষণ (differentia) বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বুদ্ধির পর্যায় মানুষের এমন যে, অন্য প্রাণীকে সেই অর্থে বুদ্ধিমান বলা চলে না। তাই এই গুণকে দিয়েই মানবেতর প্রাণী থেকে মানুষকে আলাদা করাকে অনেকেই নিরাপদ মনে করে থাকেন। আধুনিক যুগের অনেক দার্শনিক মানুষকে নিয়ে

তথা মানবজীবনের আদর্শ নিয়ে যে-সকল সার্বিক সূত্র আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তার মূল ভিত্তি হচ্ছে ঐ এ্যারিস্টটলীয় সংজ্ঞায়ন। অর্থাৎ মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন হিসেবে অন্য প্রাণী থেকে তাকে আলাদা করা, এবং বৌদ্ধিক চর্চার মাধ্যমে সর্বজনীন সূত্র আবিষ্কার করা চলে এমন বিশ্বাস। দর্শনের আধুনিক যুগ বা চিন্তার যে পর্যায়কে আলোকময়তার যুগ (the age of enlightenment) বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে সেই যুগের প্রভাবশালী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, 1724-1804) মানুষের নৈতিক জীবনের সর্বজনীন আদর্শ বা অন্যতম পালনীয় বিধান বলে যে তিনটি শর্তহীন আদেশ (Categorical Imperative) [Kant 1938 :29]-এর উল্লেখ করেছেন তাঁর তৃতীয় সূত্রে তিনি মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবেও নিজের জন্য যেমন বৌদ্ধিক আইন বা নৈতিক নিয়ম প্রণয়নকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে সর্বজনীন নৈতিক আইন প্রণয়নকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর এভাবে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তাকে সর্বজনীন ব্যবহারিক বুদ্ধির বা যুক্তির প্রয়োগকারীর মর্যাদায় ভূষিত করে– এক বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক সাম্যের দিকে মানবসত্তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। (Kant, 1938 : 49) এখন কথা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার কাণ্টীয় প্রয়াস যদি সত্য হয় তাহলে বৌদ্ধিক কারণে নিঃসঙ্গতার চেতনা সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক নয়। হেগেল প্রমুখ দার্শনিক বৌদ্ধিক সত্তা হিসেবে যুক্তি প্রয়োগের মাত্রার ওপর মানুষের জ্ঞানীয় স্তর নির্দেশ করেছিলেন। বৌদ্ধিকতা বা যৌক্তিকতার মধ্যকার পার্থিব এক দ্বান্দ্বিকতার চূড়ান্ত মীমাংসা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন পরমসত্তা বা (Absolute Idea) পরমাত্মার মধ্যে। [Thilly, 1973: 483] তবে সমকালীন অনেক দার্শনিক মানুষের বৌদ্ধক একত্ব, বৌদ্ধিকতার মাত্রা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ সমর্থন করেননি। শোপেনহাওয়ার, নীট্শে থেকে শুরু করে মিশেল ফুকো প্রমুখ অনেক দার্শনিক মানুষকে বৌদ্ধিক প্রাণী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে– এক ধরনের বৌদ্ধিক ঐক্যসূত্র দেখানোর এ্যারিস্টটলীয় তথা সনাতনী প্রচেষ্টাকে মেনে নেননি। সমকালীন দার্শনিকদের অনেকেই মানুষের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, এমনকি অবৌদ্ধিক অনেক সহজাত প্রবণতা (instrinc)-এর ওপর ও জোর দিয়েছেন।

যাইহোক, বৌদ্ধিকতার দিক থেকে মানুষ যে সকলেই একরকম চিন্তা করে না এটা আমরা খুবই সাধারণভাবে বুঝতে পারি। কেননা তাহলে সকল দার্শনিক বা যারা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন বৌদ্ধিক কাজ করেছেন তাদের চিন্তার মধ্যে অধিকাংশ দিক থেকে মিল বা সমতা থাকতো। প্রকৃত পক্ষে সমতাতো দূরে থাক পর্যাপ্ত সামঞ্জস্যও আমরা দেখি না। এভাবে বিচার করলে সকল মানুষ যারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে ভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে কারো কারো বুদ্ধি প্রয়োগের ফল দৃশ্যমানভাবেই আলাদা যা সময় ও ভৌগোলিকতাকে অগ্রাহ্য করে এক অনন্য অভিনবত্বের সূচনা করে। কারো কারো চিন্তা একান্তই তার জ্ঞানের সামাজিক বাস্তবতার

নিছক প্রতিক্রিয়া যা অন্য অনেক সমসাময়িক চিন্তাবিদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরস্পর যোগাযোগ ছাড়াই। কিন্তু এমন কেউ কেউ অনেকটা ক্ষণজন্মা হিসেবে আবির্ভুত হন যারা ঐ-সময় ও বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে না চলে স্বতন্ত্র এক ধারার জন্ম দেন। তাদের বৌদ্ধিকতা বা যুক্তিপ্রয়োগ, কল্পনা বা মনোভাব ঐ-যুগের বাস্তবতাকে অনুসরণ অনুকরণ বা নিছক মৃদু মতভেদ না করে এক বৈপ্লবিক বিবর্তনের দিক উন্মোচন করে। দর্শনের বা মনশীলতার চর্চার দিক থেকে এই জাতের দার্শনিকদের সাথে অন্যদের অমিল লক্ষ করার মত। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন: "Pholosophers are both effects and causes: effects of their social circumstances and of the politics and institutions of their time; causes (if they are fortunate) of beliefs which mould the politics and institutions of later ages." (Russell, 1996 : preface) জীবনানন্দ দাশ দার্শনিক চিন্তা বা বোধের দিক থেকে যে নিঃসঙ্গতা বা ভিন্নতা দেখিয়েছেন তা দ্বারা একাডেমিক অর্থে দার্শনকি চিন্তার গতি-প্রকৃতি কোনোভাবে হয়তো প্রভাবিত হয়নি; কিন্তু কাব্য-চেতনা বা সাহিত্যিক বোধের দিক দিয়ে তিনি যে ভিন্নতা প্রদর্শন ও নিঃসঙ্গতা প্রদর্শন করেছিলেন তা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। জীবনানন্দের বৌদ্ধিক নিঃসঙ্গতাকে তাই দুই দিক থেকে দেখা যায়: প্রথমত, সাধারণভাবে দার্শনিক বোধ, দ্বিতীয়ত কাব্য-চেতনা বা সাহিত্য-বোধ।

জগৎ জীবন সমাজ সম্পর্কে যে কোনো মানুষেরই বেশ কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসা থাকে। এই জিজ্ঞাসা এই অর্থে মৌলিক যে তা সকলকেই আলোড়িত করতে পারে, এবং এক কথায় তা সবই সর্বজনীন সমস্যা। কোন মানুষ এই সমস্যাসমূহ নিয়ে যদি যৌক্তিকভাবে ভাবনা-চিন্তা করে তাহলে তিনি দার্শনিক বলে অভিহিত হন। এক অর্থে সকল মানুষই দার্শনিক, কেননা জগৎ জীবন সমাজ সম্পর্কিত মৌলিক জিজ্ঞাসা এবং তার যৌক্তিক সমধানের প্রচেষ্টা প্রায় সকলের মধ্যেই কম-বেশি বিদ্যমান। কিন্তু যারা এই সাধারণ মানুষের থেকে অনেকটা বেশি মাত্রায় তাড়িত হন, এবং এর সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হন, সর্বোপরি বৌদ্ধিকতাকে চর্চা করার ক্ষেত্রে যারা যত বেশি অগ্রসর হবেন ততই সর্বসাধারণের থেকে তার ভিন্নতা দেখা দিতে থাকবে। এই ভিন্ন মানুষেরাই, বিশেষভাবে, অনেকটা একাডেমিক অর্থে সত্যিকারের দার্শনিক। বার্টান্ড রাসেলের ভাষায়: "The philosopher's work is, so to speak, at the second remove from crude fact." [Rassell, 1993: 1] জীবনানন্দের বোধ সাধারণের বোধের স্তর থেকে আলাদা। সাধারণ মানুষ বৈষয়িক প্রয়োজনের কারণে যে সকল বিদ্যা চর্চা করে তার মধ্যে দার্শনিক বোধের মাত্রা খুবই কম। কিন্তু যাদেরকে আমরা দার্শনিক বলি তারা ঐ বোধ দ্বারাই অধিকাংশ সময়ে তাড়িত হন। জীবনানন্দ দাশও সেই দলভুক্ত। তিনিই বেশিরভাগ সময়ে উচ্চতর বোধ দ্বারা তাড়িত হতেন। আর এই বোধ দ্বারা তাড়িত হবার

প্রসঙ্গটি তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর "বোধ" কবিতাটি শুরুই হয়েছে এভাবে:

আলো-অন্ধকারে যাই– মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে!
স্বপ্ন নয়– শান্তি নয়– ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
[দাশ, ২০১৫ : ১০৪]

এই বোধ তাঁকে অন্য কাজে, বিশেষকরে, সর্বসাধারণের মতো বৈষয়িক কাজে, নিবেদিত হতে বাধা দেয়। এ বোধ তাঁকে আটকে রাখে। তাঁকে শূন্য করে দেয়, একা করে ফেলে। তাঁর ভাষায়:

আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে;
সব কাজ তুচ্ছ হয়, পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা– প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়
শূন্য মনে হয়!
[দাশ, ২০১৫: ১০৪]

এই বোধ তথা দার্শনিক বোধ তাঁকে "সহজ লোকের মতো" সাধারণভাবে চলতে দেয় না। এই বোধ কবিতায়ই তিনি বর্ণনা করেছেন যে, সহজ লোকের মতো ভাষা, তাদের মতো কোন (বৈষয়িক) বিষয়াদি নিয়ে আলাপচারিতা, তাদের মতো করে শরীরকেন্দ্রিক তথা ইন্দ্রিয়চারিতা নিয়ে, "প্রাণের আহলাদ" নিয়ে সক্রিয় থাকা, জমিনে বীজ বোনা ও ফসল তোলা ইত্যাদি উপায়ে এ পৃথিবীর মাটি, পানি তথা প্রকৃতিকে ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মতো স্থুল চিন্তার গণ্ডিতে তিনি থাকতে পারছেন না। [দাশ, ২০১৫, পৃ. ১০৪] সর্বসাধারণের জীবনযাত্রায় একাকার হয়ে তিনি চলতে চাইলেও ঐ বোধ তাঁকে তা করতে দিচ্ছে না। তিনি উপেক্ষা করতে চেয়েছেন, কিন্তু পারছেন না। ঐ বোধ তাঁকে, তাঁর সকল গতি-বিধিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কবিতার ভাষায়:

পথে চলে পারে– পারাপারে
উপেক্ষা করিতে চাই তারে;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারি পাশে!
তবু সে চোখের চারি পাশে!
আমি চলি, সাথে সাথে সেও চলে আসে!
[দাশ, ২০১৫ :১০৪-১০৫]

জীবনানন্দ দাশ তাঁর এই বোধ এড়াতে না পারার বিষয়টিকে এক ধরনের 'মুদ্রাদোষ' বলে চিহ্নিত করেন। এই মুদ্রাদোষই তাঁকে আলাদা করে রাখে সমাজের অন্যসব সাধারণ মানুষ থেকে। সবার মাঝে থেকেও তিনি আলাদা হয়ে যাচ্ছেন, নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছেন। কবিতার ভাষায়:

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা?
[দাশ, ২০১৫: ১০৫]

'বোধ' কবিতার এক পর্যায়ে তিনি এমন বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি সাধারণের মতো করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় নানা ধরনের কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন। এমনকি, প্রেম ভালোবাসাজনিত সম্পর্কেও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন, কিন্তু ঐ প্রেম তাঁকে আটকাতে পারেনি। তাঁর আসল প্রেম ঐ উচ্চতর কোন বোধের প্রতি। সমাজের অন্যসব সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘর-সংসার সংক্রান্ত কাজ, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনজনিত কাজে তিনি বাধ্য হয়ে যুক্ত হলেও এর প্রতি তিনি একন্তভাবে আকৃষ্ট হতে পারেননি। দার্শনিক প্লেটো যেমন মানব সন্তানের জন্ম দেবার চাইতে মানস সন্তান জন্ম দেওয়াকে উন্নত দার্শনিক শ্রেণির মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেন, জীবনানন্দকে এখানে সেই দার্শনিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর এই ধরণের উন্নত দার্শনিক মননের মানুষ স্বভাবতই নিঃসঙ্গ প্রকৃতির। প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 'গুহা রূপক' (Allegory of the cave)-এর মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেন যে, দার্শনিক বোধ বিশিষ্ট মানুষ সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা, তাঁরা বৈষয়িক জীবনের স্থুল কামনা-বাসনা দ্বারা তথা ইন্দ্রিয় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। গুহার মধ্যে আজন্ম আবদ্ধ কিছু মানুষ যাদের হাত-পা সব ধারা, এবং যারা কেবল সামনের দেয়ালে দৃষ্টি রাখতে পারে যেখানে প্রকৃত বস্তুর কেবল ছায়া দেখা যায়, তা দেখে অভ্যস্থ। ঐ সাধারণের মধ্য থেকে যার ঐন্দ্রিক বন্ধন খুলে গেছে যিনি বা যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বা বোধ নিবন্ধ হয়েছে প্রকৃত সত্যের জগতে বা অন্য কথার উচ্চতর বোধের জগতে, তিনি সাধারণ মানুষের মতো করে ভাবেন না, সাধারণ জীবন যাত্রায় তিনি বা তাঁরা একাকার হয়ে যেতে পারেন না।' [Plato, 514a-520a]

যারা উচ্চতর দার্শনিক বোধে তাড়িত তাঁরা তাঁদের বোধ বা চিন্তাকেই প্রধাণত গুরুত্ব দেয়। সর্বসাধারণের মতো করে প্রচলিত মতের রীতিতে নির্বিচারে একাত্ম হতে পারেন না। এ ধরনের মানুষ কোন অথরিটিও মানতে পারেন না নির্বিচারে। সব ধরনের কর্তৃপক্ষ, প্রচলিত মত ও পথ ছেড়ে তিনি চলে আসেন তাঁর নিজের মননের কাছে। হয়ে পড়েন একান্তভাবে একা। জীবনানন্দ এই অবস্থাকেই কবিতার ভাষায় এভাবে তুলে ধরেছেন:

আমি সব দেবতাদের ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,
আমি বলি এই হৃদয়েরেঃ
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!
[দাশ, ২০১৫: ১০৬]

প্রকৃতপক্ষে জীবনানন্দের সাহিত্যকর্মে তাঁর যে বোধ প্রকাশিত হতে দেখা যায় তা কোন ক্ষমতাশীনদের স্তুতি, বিশেষ মতাদর্শের প্রচারণা ছিলোনা, সুনির্দিষ্ট কোন ঐতিহাসিক উপাদান বা বিষয় সম্পর্কিত আকর্ষণও ছিলো না তাঁর সাহিত্যে। বরং ইতিহাসের অখ্যাত বিষয়, প্রকৃতির অবহেলিত উপাদানের প্রতিই তাঁর ঝোক ছিলো। সবাই যে বিষয়গুলোকে অনেকটা উপেক্ষা করেছেন তাকেই তিনি মহিমান্বিত করে তুলতে চেয়েছেন। এতেই তাঁর বোধের ভিন্নতা ধরা পরে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পেঁচা, কাক, শালিক, শঙ্খ, চিল, হিজল গাছ, বেতের ফল, চাল ধোয়া পানি, ইঁদুর, ঘাসের ঘ্রাণ ইত্যাদিকে তিনি মহিমান্বিত করে তুলতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত কোন কিছুর বদলে অপ্রধান, গুরুত্বহীন অথবা ধ্বংসপ্রান্ত সভ্যতার কোন 'ধুসর যুগের' কথাই তিনি যেন বেশি করে বলেছেন। যেমন এশিয়ীয়, ব্যাবিলনীয় মিশরীয় ইত্যাদি প্রাচীন এবং বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার কথা বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের ইতিহাস চেতনা কেউ কেউ সাব-অল্টার্ণ ইতিহাস বোধ বলে চিহ্নিত করেছেন। [ইসলাম, ২০০০: ১০১-১০৩]

জীবনানন্দ 'ঘাস' হতে চেয়েছিলেন, [দাশ, ২০১৫: ১৭৫] হতে চেয়েছিলেন "শঙ্খ", "চিল", অথবা "ভোরের কাক"। [দাশ, ২০১৫: ১৫০] এমনকি তিনি একজন অসুস্থ রোগীর মাথার নিকটে রাখা একটি 'কমলা লেবু' হবারও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। [দাশ, ২০১৫: ১৮৫] জীবনানন্দ তাঁর নির্জনতার আশ্রয় হিসেবে বা নিঃসঙ্গতার সঙ্গ হিসেবে প্রকৃতির মধ্যে নিবিড়ভাবে অবগাহন করতে চেয়েছেন। আবহমান বাংলার খুবই সাধারণ প্রাকৃতিক পরিবেশে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন। এখানে একটি কাঁঠাল গাছ, হিজল গাছ, ঝড়া পাতা শালিকের হলুদ পা'ও তাঁর নিকট অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছে। "রূপসী বাংলা" নামক কাব্যের বহু কবিতায় তিনি নিঃসঙ্গতার আশ্রয় বা ঠিকানা হিসেবে গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশকে বেছে নিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাইনা আরঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছ
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি-চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ

জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের অশথের করে আছে চুপ;
ফনীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;
[দাশ, ২০১৫: ১৪৪]

জীবনানন্দ দাশ তাঁর চিন্তা-চেতনায় যেমন স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছেন তেমনি তাঁর নিঃসঙ্গতার আশ্রয় হিসেবে তিনি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করেছেন তা-ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। উপরে উল্লেখিত কবিতাংশটিতে আমরা দেখতে পাই তিনি বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশের একান্ত নিজস্ব উপাদানসমূহকে তাঁর নিঃসঙ্গতার আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিকে একান্ত আপন করে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করার প্রয়াসের বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত কবিতায়:

তোমার যেখানে সাধ চলে যাও– আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব; দেখিব কাটালপাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব খয়েটি ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে,
ধবল রোমের নিচে তাহার হলুদ ঠ্যাং ঘাসে অন্ধকারে
নেচে চলে– একবার-দুইবার– তারপর হঠাৎ তাহারে
বনের হিজল গাছ ডাক দিয়ে নিয়ে যায় হৃদয়ের পাশে;
[দাশ, ২০১৫: ১৪৩]

বাংলাদেশ বা আবহমান বাংলার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে তিনি কেবল কাব্যে থাকতে চেয়েছেন তা নয়, তিনি তাঁর বোধের জগতেও ছিলেন দেশীয় বা স্বকীয় সম্পদ লালনের পক্ষে। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং শিক্ষক ছিলেন তিনি। তাঁর চিন্তায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব থাকতে পারে, তিনি তা স্বীকারও করেছেন। [জীবনানন্দ, ১ম সংখ্যা ২০১৮ পৃ.] কিন্তু তাঁর বোধের স্বাতন্ত্র সেখানেও সজীব ছিলো তিনি কোন চেতনার অন্ধ অনুকরণ করেননি। কোন ধারণা, সাহিত্যকর্ম, দর্শন তাঁকে আলোড়িত করতে পারে, কিন্তু সেই আলোড়ন কেবল অনুসঙ্গ মাত্র; তাঁর সাহিত্যকর্ম ঐ অনুসঙ্গকে ধারণ করেও ধাবিত হয়েছে স্বীয় বোধের দ্বারা সিক্ত এক স্বকীয় সংস্করণে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে জীবনানন্দের বিখ্যাত ‘বনলতা সেন’ কবিতার সাথে ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত কবি এডগার এলান পো (১৮০৯-১৮৪৯ খ্রি.)-এর “To Helen" কবিতার কিছুটা মিল লক্ষ করা যায়। অন্য এক প্রসিদ্ধ আউরিস কবি ডাব্রিউ বি. ইয়েটস (১৮৬৫-১৯৩৯ খ্রি.)-এর কিছু কবিতার সাথে তাঁর কবিতার মিল রয়েছে। কিন্তু এসব কবিদের কবিতা এবং জীবনানন্দের কবিতার রস, রূপ ও আবেদন একেবারেই আলাদা।

কেবল বিদেশি সাহিত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন সময়ের কোন বিশেষ কবি বা কাব্যধারার অনুকরণ তাঁর মধ্যে তেমন একটা লক্ষ করা যায় না। বরং তিনি

তাঁর যুগের সকল চেতনাকে ধারণ করে একান্ত নিজস্ব মননের দ্বারা তাকে বিচার করে তার ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র এক স্টাইলে তিনি তাঁর শৈল্পিকতাকে প্রকাশ করেছেন। তাই তাঁকে আমরা যুগ-সচেতন, নানারকম তত্ত্ব-মতাদর্শের বোদ্ধা, এমনকি, ইতিহাস ঐতিহ্যের চেতনায় সিক্ত হিসেবে পেলেও কোন বিশেষ দলে বা গোত্রে তাঁকে আবদ্ধ করতে পারি না। তাঁর স্থান একান্তই তাঁর। তিনি নিঃসঙ্গ। এ প্রসঙ্গে কথাসাহিত্যিক শাহাদুজ্জমানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

> "বিশ শতকের প্রথম অংশে কেটেছে তাঁর [জীবনানন্দ দাশের] জীবন, কিন্তু সেই সময় তাঁর দেশের এবং সারা পৃথিবীর মানবসত্তার নির্যাস তিনি ধারণ করেছিলেন, টের পেয়েছিলেন আগামী শতাব্দির মানুষ কোন্ বোধের দোলাচলের ভেতর দিয়ে যাবে। আমাদের কাছে তাই তাঁর লেখা মনে হয় আমাদের সময়েরই একেবারে নাড়ির সাথে যুক্ত। অসম্ভব মেধাবী একজন মানুষ। তাঁর প্রবন্ধ, ডায়েরিগুলো পড়লে বোঝা যায় কী ব্যাপক তাঁর পঠন-পাঠন। সাহিত্য ছাড়াও তাঁর পঠন-পাঠন পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি নিয়ে। এনসাইক্লোপেডিক তাঁর জ্ঞানজগত। কিন্তু শুধু মনন তাঁকে শাসন করেছিল, মানুষের মনের নিবিড় পর্যবেক্ষক তিনি। সেই মনন, সেই মনকে ধরতে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষার গতিপথকে বদলে দিয়েছেন। তৈরি করেছেন একেবারে নিজস্ব এক সাহিত্যভূবন।" [শাহাদুজ্জামান, ২০১৮: ৩২]

বস্তুত জীবনানন্দ দাশের নিজস্ব যে সাহিত্যভূবন তা তাঁর বোধের স্বকীয়তাকেই প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিমানুষের তাঁর সকল কর্মকাণ্ড, বিশেষকরে, বড় মানের কোন কাজে অবশ্যই তাঁর ব্যক্তি-চেতনা বা ব্যক্তিগত বোধই প্রাধান্য পায়। ব্যক্তিগত চেতনার স্বাতন্ত্র না থাকলে কোন স্বতন্ত্র ধারার মহৎ কাজ করা সম্ভব হয় না। জীবনানন্দের কাব্য সাহিত্যে যে স্বাতন্ত্র আমরা লক্ষ করি তা নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব বোধেরই প্রতিফলন। এই বোধের দিক থেকে তিনি নিঃসঙ্গ বিধায় তাঁর কর্মও সবার থেকে অনেক দিক থেকে আলাদা।

দুই

জীবনানন্দের সাহিত্যে নিঃসঙ্গতার যে চেতনা প্রকাশিত হয়েছে তার পেছনে এক ধরনের অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চেতনা কাজ করেছে বলে মনে করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে সমকাল অবধি অস্তিত্ববাদ (existentialism) নামক একটি দার্শনিক মতবাদ বা আন্দোলন পাশ্চাত্যে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। সোরেন কিয়ার্কেগার্দ (Soren Kierkegaard, 1813-1855) নামক একজন ডাস দার্শনিক এই মতবাদের প্রথম উদ্যোক্তা বা জনক হিসেবে পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্ধেই

পর পর দু'টি মহাযুদ্ধ অস্তিত্ববাদী দর্শনকে বেশ জনপ্রিয় করে তোলে। কিয়ার্কেগার্দের পরে নীট্‌শে, হাইডেগার, জেসপার্স, সার্ত, ক্যামু প্রমুখ এই মতের প্রধান তাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত। এঁরা সকলেই পাশ্চাত্য তথা ইউরোপীয় ভাবুক। এঁদের সকলের আবির্ভাবের ধারাবাহিকতা অথবা সময়ের সন্নিকটতা থাকলেও এঁদের অস্তিত্ববাদী ধারণার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষণীয়। অন্যদিকে, এঁদের কেউ কেউ আবার নিজেদের অস্তিত্ববাদী হিসেবে পরিচয় দিতেও অস্বীকৃতি জানান। তার পরেও তাঁদের অনুসারী, ব্যাখ্যাকার এবং দর্শনের প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির লোকেরা তাঁদের সকলকেই অস্তিত্ববাদী হিসেবেই অভিহিত করে থাকেন। [Warnock, 1986: 1]

এখন কথা হলো, কেন কিছু চিন্তাবিদদের এই বিশেষ নামে আখ্যায়িত করা হয়, এমনকি তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অস্তিত্ববাদী হওয়ার জন্য বা কোন মতকে অস্তিত্ববাদী বলে চিহ্নিত করার জন্য বেশকিছু বৈশিষ্ট্য দার্শনিক সমাজে মোটামুটিভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেই বৈশিষ্ট্যের ধারক হলে যে কোন চিন্তাকে অস্তিত্ববাদী চিন্তা এবং যে কোন চিন্তককে অস্তিত্ববাদী চেতনার ধারক বলে চিহ্নিত করা চলে। এমনকি, তিনি দার্শনিক সমাজের কেউ না হলেও অর্থাৎ পেশাদারভাবে দর্শনচর্চা না করেও কেউ অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃত হতে পারেন। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, অস্তিত্ববাদী বলে পাশ্চাত্যে যাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাঁদের অনেকেই পেশাগতভাবে দর্শনের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন না।

যাইহোক, আমাদের সেইসকল বৈশিষ্ট্যের কথা বলা আবশ্যক যার দ্বারা কোন চিন্তাবিদকে আমরা অস্তিত্ববাদী চিন্তক বলতে পারি। এবং তারপর জীবনানন্দকেও আমরা সে দলে ফেলতে পারি কিনা তা দেখার চেষ্টা করি। অস্তিত্ববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, এমন এক স্বীকৃতি যে, মানুষের কোন পূর্ব নির্ধারিত সারধর্ম (essence) নেই। মানুষের সারধর্ম বা সার্থকতা তাকে অর্জন করতে হয়। কোন জীবনই অর্থপূর্ণ নয়, অর্থ প্রদান করতে হয়। জীবনানন্দও এমনটি মনে করতেন। তিনি এমন মত ধারণ করতেন যে, মানুষের জীবনের সার্থকতা বা অর্থ কোন সময়েই সুনির্ধারিত বা তৈরি থাকে না। তাঁর ভাষায়: "স্বরূপ সম্বন্ধে কোনও শেষ সত্য লাভ হয় না। কোন যুগ সত্যের নিকটে এগিয়ে যায় খানিকটা, কোনও যুগ পিছিয়ে পড়ে আবার।" [দাশ, ২০১৭: ৭৮] তবে অস্তিত্ববাদের সর্বাপেক্ষা দৃশ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো শূন্যতার বোধজনিত উদ্বেগ, এবং চরম ব্যক্তিবাদিতা (subjectivity)। এই দু'টি বৈশিষ্ট্য যে কোন মানুষকে নিঃসঙ্গ-চেতনার ধারক করে ফেলে। জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যে অস্তিত্ববাদী চেতনার এই দু'টি দিক খুবই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাই বলা চলে তিনি অস্তিত্ববাদী বোধজনিত কারণেও নিঃসঙ্গতার চেতনাকে সাহিত্যিক রূপ বা শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন।

অস্তিত্ববাদী চেতনায় উৎসারিত নিঃসঙ্গতার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে জীবনানন্দের "মহাপৃথিবী" নামক কাব্যগ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন" নামক কবিতায়। এই কবিতায় একটি আত্মহত্যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে তার লাশটি রাখা হয়েছে লাশকাটা ঘরে। কোনদিন সে আর জাগবে না। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কবির বর্ণনায় ঐ ব্যক্তির সংসার ছিলো, সন্তান ছিলো, বৈষয়িক তেমন কোন সমস্যাও ছিলো না যা বাহ্যিকভাবে লোকের চোখে পড়তে পারে। তবুও তার জীবনে যেন ভালো ঘুমের ব্যবস্থা ছিলো না। যেন সে বহুকাল ভালোমতো ঘুমাতে পারেনি। কবিতার ভাষায়ঃ

শোনা গেল লাশকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ।
বধু শুয়ে ছিল পাশে-শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল– জোছনায়– তবু সে দেখিল
কোন্ ভুত? ঘুম কেন ভেঙ্গে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল, লাশকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার
এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি!

[দাশ, ২০১৫: ২০৪]

এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঘটনার নায়ক ব্যক্তিটির কোন এক অদৃশ্য শূন্যতা আছে। এই শূন্যতা তার পরিবার-পরিজন ও বৈষয়িক জীবন-চেতনা থেকে ভিন্ন রকমের। এই বোধ বা চেতনা সকলের থাকে না। জীবনের একান্ত ব্যক্তিবাদী উপলব্ধি যা কোন ব্যক্তিকে গতানুগতিক সমাজ-সংস্কার থেকে ভিন্ন নিঃসঙ্গ ও শূন্য করে ফেলে, যখন কোন ব্যক্তিমানুষের নিকট এমন কিছু নিজস্ব প্রাপ্তির বিষয় থাকে যা অন্যমানুষ ঠিকমত বুঝতে পারে না, তখন তিনি নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে পারেন। অস্তিত্ববাদী উপলব্ধি এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি করে যেখানে ব্যক্তিমানুষ কোন অবস্থায়ই পূর্ণ নয়। মানুষের পূর্ণ সত্তা বা সারসত্তা (essence) কখনই তার মধ্যে অবস্থান করে না। তা সর্বাবস্থায়ই অধরা। আমরা প্রত্যেকেই যে জীবন যাপন করছি এটা আমাদের অপূর্ণ জীবনের একটি ধারাবাহিকতা, আমাদের প্রকৃত মানুষ বা মানবসত্তা আমরা কখনই বহন করি না বা ধারণ করি না। এই বিশেষ অর্থে জ্যাঁ, পল সার্ত ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, মানুষ হলো তাই যা সে নয়। তিনি একটি টেবিল বা যে কোন বস্তুকে, যার চেতনা নেই, তাকে পূর্ণ বলেছেন, কিন্তু মানুষ অর্থাৎ চেতনাশীল মানুষ কখনও পূর্ণ নয়। টেবিলটি পূর্ণ, কেননা এটা যা তা-ই হয়ে গিয়েছে (It is what it is); নতুন করে

কোন কিছু হবার চেতনাও যেমন কোন টেবিলের নেই, তেমনি তার আর কিছু হবার যোগ্যতাও নেই। কিন্তু চেতনশীল মানুষ নিজের অক্ষমতাসমূহ বুঝতে পারে তেমনি তার ভেতর বিদ্যমান অনেক কিছু হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকেও সে চিহ্নিত করতে পারে। এই চেতনাও অসীম সম্ভাবনা তথা এক অব্যাক্ত অধরা পূর্ণতার বোধ যার বা যাদের আছে তিনি বা তারাই (ব্যক্তিগতভাবে) অস্তিত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃত অস্তিত্বশীল মানুষ। আর সমাজের যে কোন অবস্থার মানুষই হোক না কেন তার যদি ঐ ধরনের পূর্ণতার জ্ঞান না থাকে নিজের অপূর্ণতার ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত সজাগ হয়ে তা পূর্ণ করার প্রতি আন্তরিক আকুতি না থাকে, তাহলে তাদের জীবন সত্যিকারের মানবজীবন নয়; অস্তিত্বশীল মানুষ তারা নন। তারা টিকে আছে, যেমন করে টেবিলেরও অবস্থান আছে। তারা বেঁচে আছে, যেমন করে অনেক ইঁতর প্রাণিও বেঁচে আছে। এ সকল বস্তু ও ইঁতর প্রাণি থেকে সত্যিকারের সচেতন অস্তিত্বশালী মানুষের জীবনের পার্থক্য আছে। জীবনানন্দ দাশ এই পার্থকের কথাই তাঁর "আট বছর আগের একদিন" নামক কবিতায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন:

"যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
এই জেনে।" [দাশ, ২০১৫: ২০৫]

এখানে মানুষের জীবন বলতে কেবল রক্ত-মাংসের মানুষের কথাই বলা হয়নি। বলা হয়েছে একজন যথার্থ অস্তিত্বের চেতনা ও সেই রকম পূর্ণমানুষ হবার প্রচেষ্টাধারী মানুষের কথা। এরকম মানুষ নিছক জীবিত সত্তা হিসেবে দিনের পর দিন, এমনকি, এক মুহূর্ত হলেও বেশি বেঁচে থাকার লালসায় লালায়িত নয়। তাইতো তিনি বলেছেন:

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দু'ই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়– অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
টের পাই যুথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারি দিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবেসে।
রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালী রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি'
[দাশ, ২০১৫: ২০৫]

এভাবে কেবল জীবন টিকেয়ে রাখা কোন মানবেতর প্রাণির প্রচেষ্টা হলেও হতে পারে, কিন্তু যথার্থ মানবজীবনের অস্তিত্ব এর থেকে ভিন্ন কিছু বলেই অস্তিত্ববাদী ভাবনার লোকেরা মনে করেন। জীবনানন্দের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তিনি এমন জীবন চাননি, যে জীবনে কোন নান্দনিক উচ্চতা নেই, যে জীবনে কোন বোধের

উচ্চতা নেই; তিনি মানবিক জীবন চেয়েছেন। আর এমন জীবন অবশ্যই পশু-পাখি বা কীট-পতঙ্গ থেকে ভিন্ন। মানুষের মধ্যে অধিকাংশের জীবনই কেবল বেঁচে থাকা এবং স্বাভাবিক বৈষয়িক কর্ম-কাণ্ডের মধ্যেই রুটিনবদ্ধ। জীবনের মহত্ব, জগতের সাথে জীবনের সম্পর্ক এবং উচ্চতর কোন আদর্শের প্রতি ব্যক্তিমানুষের এক নিবিড় আন্তরিক অনুসন্ধান গড়-পড়তা মানুষের জীবনে নেই। সমাজের অধিকাংশ মানুষই যেন গতানুগতিক জীবন যাপনে অভ্যস্থ। অনেক ক্ষেত্রে গড্ডালিকা প্রবাহে মত্ত। কিন্তু অস্তিত্বের চেতনা দ্বারা উদ্‌বেলিত কোন ব্যক্তিমানুষ এদের থেকে আবশ্যিকভাবেই বিচ্ছিন্ন। উপরে উল্লেখিত কবিতাটির নায়ক এমনি একজন মানুষের প্রতীক বা প্রতিনিধি। এই মানুষটি তাই স্বাভাবিক জীবন যাপনের কোন অর্থ খুঁজে পাননি। আর সেকারণেই তার 'মরিবার সাধ' হয়েছে। জীবনানন্দ এখানে আত্মহত্যার সমর্থন করেছেন এমন ভাবারও কোন কারণ নেই। আত্মহত্যার ঘটনা বা বিবরণ কবিতাটির মূল প্রতিপাদ্য নয় বলেই মনে হয়। কেননা জীবনানন্দ এই পার্থিব জীবনের অর্থ খোঁজার প্রক্রিয়ায় একেবারে ব্যর্থ হননি। তিনি এক নান্দনিক তৃপ্তির মধ্যে জীবনের সার্থকতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনেক কবিতায় তথা সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিমানুষের জীবনের এক ধরনের নান্দনিক সার্থকতাকেও তিনি চিত্রিত করেছেন। আর এর মাধ্যমে তিনি অস্তিত্বের সংকট তথা অস্তিত্ববাদী চেতনা-জনিত নিঃসঙ্গতার সংকট কাটিয়ে পার্থিব জীবনের এক ধরনের নান্দনিক অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এই ধরনের নান্দনিক অর্থ খোঁজার এক বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'মৃত্যুর আগে' নামক কবিতায়। এ কবিতায় তিনি পার্থিব জীবনের নানান নান্দনিক অভিজ্ঞতার কথা তিনি তুলে ধরেছেন। এই অভিজ্ঞতাকে তিনি নানান চিত্রকল্পের দ্বারা তুলে ধরেছেন। এই চিত্রকল্প যাকে বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্ররূপময়তা' বলে অভিহিত করেছিলেন– তা মূলত জীবনের কিছু বাস্তব নান্দনিক অনুভবের চিত্র। কিছু উদাহরণ নিচে তুলে ধরা যাক:

> আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধায়,
> দেখেছি মাঠের পরে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
> কুয়াশায়; কবেকার পড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
> তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
> জোনাকিতে ভরে গেছে।
>
> [দাশ, ২০১৫: ১৩৯]

এই কবিতাটিতে আরও অনেক চিত্ররূপ যেমন: 'দীর্ঘ শীতারাত্রী' 'পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ', 'অশত্থের ডালে ডেকে ওঠা বক', 'চালের ধুসর গন্ধ;, 'বৈশাখের প্রান্তরে সবুজ বাতাস, নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল', শুপারির সারি বেয়ে আসা সন্ধা' 'ম্লান ধূপের শরীর' ইত্যাদি। [দাশ, ২০১৫, পৃ. ১৩৯-১৪০] এই সকল চিত্ররূপ দিয়ে গড়ে

ওঠা অনেক নান্দনিক রূপকল্প দিয়ে জীবনানন্দ জীবনকে অর্থবহ করার প্রচেষ্টার এক পর্যায়ে বলেছেন:

> আমরা মৃত্যুর আগে কী বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা
> সব বাঙ্গা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
> ধূসর মৃত্যুর মুখ– একদিন পৃথিবীতে সপ্ন ছিল– সোনাছিল যাহা
> নিরুত্তর শান্তি পায়– যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।
> কী বুঝিতে চাই আর? রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
> শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক!
> [দাশ, ২০১৫: ১৪০]

মৃত্যু অমোঘ সত্য। সকল অস্তিত্ববাদী, এমনকি, সাধারণ মানুষও মৃত্যুকে তার অস্তিত্ব এবং জীবনের সফলতার জন্য অলঙ্ঘনীয় হুমকি মনে করে থাকেন। মানুষের জীবনের ব্যাপ্তি, কাজের উদ্যমতা, কাজ করে শেষ করা এই সবকিছুই চিরদিনের জন্য যে ঘটনা বন্ধ করে দিতে পারে তা হলো মৃত্যু। মৃত্যু অমোঘ সত্য। সকল অস্তিত্ববাদী, এমনকি, সাধারণ মানুষও মৃত্যুকে তার অস্তিত্ব এবং জীবনের সফলতার জন্য অলংঘনীয় হুমকি মনে করে থাকেন। মানুষের জীবনের ব্যাপ্তি, কাজের উদ্যমতা, কাজ করে শেষ করা এই সবকিছুই চিরদিনের জন্য যে ঘটনা বন্ধ করে দিতে পারে তা হলো মৃত্যু। অস্তিত্ববাদী চেতনার মানুষ অস্তিত্বের প্রক্রিয়ায় যে সারসত্তা (essence) অনুসন্ধান করে চলে, সেই সারসত্তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে মৃত্যু' একেবারেই নাকচ করে দিতে পারে। এই বিষয়টি সকল অস্তিত্ববাদী স্বীকার করেছেন। তবে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা মৃত্যুকে চূড়ান্ত অর্থে নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়া, কিংবা অস্তিত্বের দৌড় থেকে নিজেকে নিবৃত করার কোন অজুহাত মনে করেন না। তাঁরা মূলত মৃত্যু না আসা পর্যন্ত জীবনকে সচল রাখতে চান। এই সচল জীবন হলো আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-অতিক্রমের চেতনা ও প্রয়াসজনিত সচলতা। মৃত্যুকে স্বীকার করেও এই প্রক্রিয়া সচল রাখা চলে। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইডেগার মৃত্যুকে 'ব্যক্তিসত্তার গভীরতম সম্ভাবনা" বলে চিহ্নিত করেছেন Heidegger, 1956: 76)। তাঁর মতে, ব্যক্তিমানুষের সংকীর্ণ জীবনের অসংখ সম্ভাবনার মধ্যে মৃত্যু একটি চরম সম্ভাবনা। অন্য যে কোন সম্ভাবনা বাস্তবায়িত না হলেও মৃত্যু নিশ্চিতভাবে বাস্তবে রূপ নেয়। কিন্তু অস্তিত্বের প্রক্রিয়া, স্বাধীনভাবে সত্তার অভিমুখে যাত্রা, সচেতনতা (care) এজন্য বাধাগ্রস্থ হতে পারে না। অস্তিত্ববাদের অন্য একজন পুরোধা জ্যাঁ. পল সার্ত অনেকটা এরকম কথাই বলেছেন। তিনি সীমিত ব্যক্তিজীবনকে সর্বদাই স্বাধীন বলে ভেবেছেন। মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "আমার স্বাধীনতা আমারই, সে পূর্ণ এবং অনন্ত। মৃত্যু আমার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধা নয়। আমি মরবার জন্য স্বাধীন নই; বরং আমি একটি স্বাধীন মরনশীল সত্তা" (Sartre : 670)। জীবনানন্দও এটা মেনে নিয়েছেন যে "সব

রাঙা কামনার শিয়রে ধূসর মৃত্যুর মুখ এসে জাগে।” কিন্তু এতে করে তিনি এই সৌন্দর্যময় পৃথিবীর নানা রূপ বৈচিত্র্য উপভোগের সুখকে অবমূল্যায়ন করতে চান না। আমাদের সীমিত জীবনে সসীম সত্তার প্রাপ্তি হিসেবে এইসব যথেষ্ট বলে তিনি মনে করেছেন। এ ক্ষেত্রে জীবনানন্দকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদী বলা চলে।

তবে মৃত্যুর আগে জীবনের ছোট ছোট প্রাপ্তিকে মহিমান্বিত করে তুলে জীবনকে সার্থক করার বা ভাবার যে উপলব্ধিই তার সান্ত্বনার আশ্রয় হোক না কেন এই উপলব্ধিও সার্বিক জীবনের ভোগান্তির তুলনায় কতটুকু প্রণোদনাদায়ক– তা প্রশ্নাতীত নয়। “আট বছর আগের একদিন” কবিতাতায় অস্তিত্বের অন্তহীন যাত্রায় ক্লান্ত ব্যক্তিটিকে জোনাকির সৌন্দর্য, পঞ্চমীর চাঁদ স্বস্তির হাতছানি দিয়েছিলো ঠিকই, কিন্তু এতে তিনি শান্ত হননি। হাজার বছর ঘুরে যে নায়ক বনলতা সেনের চোখের মধ্যে মায়া ও ভালোবাসার আশ্রয় দেখতে পেয়েছিলেন– সেই শান্তিও ছিলো “দু’দণ্ড”। তবুও জীবন চলবে জীবনের গতিতে– সকল দুঃখ-বেদনা, ঘটনা-দুর্ঘটনা বয়ে নিয়ে। তাকে দেখতে হবে নিজের ও অন্যের জীবনের অনেক প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির ঘটনা হিসেবে। আর এসব দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি একা– এই বোধই যেন সজীব হয়ে ওঠে। এজন্যই তিনি ঘুমোতে চান। এমন ঘুম যে ঘুমের কোন শেষ নেই। আছে চির স্বস্তি। “লাশ কাটা ঘর” হয়তো সেরকম শান্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে কবির কাছে। তার উত্তম পুরুষের বর্ণিত ঘুমের স্থান হয়েছে নির্জন প্রকৃতি এবং তা অন্ধকারে। যেমন “অন্ধকার” কবিতায় তিনি বলেছেন:

ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে ছিলাম– পউষের রাতে–
কোন দিন আর জাগব না জেনে
কোন দিন জাগব না আমি– কোনদিন জাগব না আর–
হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে অগাধ ঘুম
সে–আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেল তীব্রতা তোমার নেই,
[দাশ, ২০১৫: ১৮৪]

তিন

জীবনানন্দ দাশের নিঃসঙ্গতার অন্য একটি প্রধান কারণ হিসেবে মানবজীবনের প্রতি তার নেতিবাচক ধারণাকে দায়ী করা যায়। তাঁর মানবজীবনের প্রতি এরকম নেতিবাচক ধারণার পেছনে কি কোন দার্শনিক চেতনা আছে? অথবা তাঁর এই নেতিবাচক চেতনার পেছনে কি কোন সুগঠিত দার্শনিক তত্ত্বের প্রভাব আছে? দর্শনে দুঃখবাদ (pessimism) নামক একটি ধারা আছে যা মানবজীবনকে সার্বিকভাবে দুঃখের বলে চিত্রিত করে।

জীবনানন্দ কী এমন ভাবনা থেকে জগৎ-বিমুখ নিঃসঙ্গ ছিলেন? নাকি অন্য কোন প্রচলিত দার্শনিক চেতনা বা তাঁর নিজের ভিন্ন মাত্রিক চেতনাই মানবজীবনের প্রতি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করেছে এবং তার ফল হিসেবে তিনি নিঃসঙ্গতা, এমনকি, চিরস্তব্ধতা কামনা করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্মের নানা জায়গায়? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পূর্বে জীবনানন্দের বর্ণিত মানবজীবন এবং পার্থিব জগত সম্পর্কে তাঁর সাহিত্যিক বা শৈল্পিক উপস্থাপনার কিছু দিক তুলে ধরা প্রয়োজন যেখানে তিনি এই জাগতিক জীবনকে নেতিবাচক হিসেবে তুলে ধরেছেন। "জীবন" কবিতায় তিনি বলেন:

জীবন, আমার চোখে মুখ তুমি দেখেছ তোমার–
একটি পাতার মতো অন্ধকারে পাতা-ঝরা গাছে–
একটি বোটার মতো যে ফুল ঝরিয়া গেছে তার–
একাকী তারার মতো, সব তারা আকাশের কাছে–
যখন মুছিয়া গেছে– পৃথিবীতে আলো আসিয়াছে–
যে ভালোবেসেছে, তার হৃদয়ের ব্যাথার মতন–
কাল যাহা থাকিবেনা– আজই যাহা স্মৃতি হয়ে আছে–
দিন-রাত্রি– আমাদের পৃথিবীর জীবন তেমন!
[দাশ, ২০১৫: ১২২]

পার্থিব জীবনের সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের জীবনও ক্ষণস্থায়ী। এই রূপ-রস-বর্ণের পৃথিবী নানা সময় নানান অবস্থা ধারণ করে। আমাদের জীবনও তেমনি; কোন কিছুতেই স্থিতি নেই, স্তস্থি নেই, নেই নিশ্চয়তা। এই পার্থিব জীবনের নানা কর্ম, প্রেম-ভালোবাসা সবই যেন মুছে যায়। অথবা কেবল স্মৃতি হয়ে থাকে।

জীবনানন্দ দাশ এ জগত সংসারকে দেখেছেন একটি ফাঁদ হিসেবে। এই ফাঁদে আমরা সকলেই পা দেই। এ যেন এক মোহ, যা আমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় কোন নিশ্চিত বিপদের দিকে।

জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতাটিতে হরিণ শিকারের এক রূপক বর্ণনায় মানবজীবনের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। এখানে এক 'ঘাইহরিণীর' ডাকে বনের হরিণ শিকারের এক ঘটনার উদাহরণ অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বনের কাছে ক্যাম্প ফেলেছেন কবি। তিনি নিজে শিকারী নন। তিন দর্শক। তিনি দেখছেন 'ঘাইহরিণী'র ডাকে কীভাবে হরিণেরা (পুরুষ) ছুটে আসছে। এবং সেই সুযোগে শিকারীরা তাদের গুলিবিদ্ধ করে শিকার করছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে:

এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি–

কাহারে সে ডাকে!
কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার;
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
আমিও তাহাদের ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।
[দাশ, ২০১৫: ১১২]

বনের মধ্যে যেমন শিকারীরা নানা সুযোগে হরিণ শিকার করে, তেমনি এই হরিণের মতো করে পৃথিবীতে নানাভাবে মানবজীবন হুমকির মুখে। কখন কে কার শিকারে পরিণত হয়, প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কোন্ দুর্যোগে ব্যক্তিমানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে– তা অনেক সময় বোঝা যায় না। প্রতি মুহূর্তেই মানুষের সামনে রয়েছে বিপর্যয়ের হুমকি। কোন এক জোছনা রাতে লোভে-লালসায়-কামনায় পুরুষ হরিণ আসছে মৃগী হরিণের ডাকে, তারা ছুটে আসছে জোছনা রাতে বনের গহীনে। কিন্তু তারা কি জানে যে এই মোহ তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাবে? আসলে তারা জানে না। ক্যাম্পে শুয়ে থেকে কবির এই বোধ গভীরভাবে নাড়া দিচ্ছে। তিনি ঘুমাতে পারছেন না। আর এরই মধ্যে তিনি গুলির শব্দ শুনতে পান। এর মানে মৃত্যুর বার্তা। নির্বোধ হরিণের মৃত্যু। তিনি এর নিরব প্রত্যক্ষকারী। এই মৃত্যুর বার্তা তাকে বিচলিত করে তোলে। কবির ভাষায়:

ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি;
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে পড়ে থেকে একা একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণের ডাক শুনে শুনে।
[দাশ, ২০১৫: ১১৩]

অতঃপর কবি নিজেকে প্রশ্ন করেন: কেন এই হরিণের মৃত্যু বারতা শুনে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন? কেন তিনি ঘুমাতে পারেন না? এর কারণও তিনি ব্যক্ত করেছেন এই কবিতার শেষ দিকে। হরিণ শিকারের ঘটনা বা হরিণের এরকম বিপদে পরার ঘটনাকে তিনি মানবজীবনের তথা ব্যক্তিমানুষের বিপদ সংকুল জীবনের সাথে তুলনা

করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের জীবন, এমনকি তার নিজের জীবনের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেছেন যে, তাঁর জীবনেও কি এমন বিপদ আসেনি যার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ না করলেও মৃতুকে আলিঙ্গন করতেই বরং ইচ্ছা পোষণ করছেন! নিজের উদ্দেশ্যে তিনি তাই বলেন:

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাহাদের মত নই আমিও কি?
কোন এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোন এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে জোছনায়– দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মতো?

[দাশ, ২০১৫: ১১৩]

মৃত মৃগের মাংস দিয়ে যেমন আমরা মানুষেরা তৃপ্তি করে আহার করি, তেমনি বাস্তব জীবনেও কারো কারো স্থূল সুখ অন্যের জীবনকে দগ্ধ করে, নষ্ট করে, এমনকি, শেষ করে দেয়। এ পার্থিব জীবনে এভাবেই আমরা সকলে অর্থাৎ প্রত্যেকে নানারকম টোপে পরে যন্ত্রণায় কাতর। এই ব্যক্তিজীবনের বোধ কবিকে মূলত সার্বিক মানবজীবনের তথা মানবসমাজের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করে ভাবায়। তিনি স্পষ্ট করেই বলেন:

ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে;
যাহাদের দোনলার মুখে আজ হরিণেরা মরে যায়
হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন–
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাহাদের হৃদয়
কথা ভেবে– কথা ভেবে– ভেবে।
এই ব্যথা, এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে–
কোথাও ফড়িঙে– কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জোছনায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

[দাশ, ২০১৫: ১১৪]

জীবনানন্দের নিকট জীবন এক অনাবিল সংগ্রামের নাম। এক অনির্দেশ্য যাত্রা। অবিরাম ছুটে চলা। এখানে মায়া-মমতার দোহাই দিয়ে কারো কাছে নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাসের আশ্রয় নিয়ে বসে থাকলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনা তাকে আকড়ে ধরে। জীবন কাউকে করুনা করবে, আপনা-আপনি প্রণোদনা দেবে এ ভাবনা করাটা মুখ্যতা। এ পৃথিবীতে কোথাও মানুষের জন্য নিশ্চিত সুখের অলস আশ্রয় নেই, সেটা নিজগৃহ হোক

অথবা অন্য কোথাও। সময়ের সাথে সাথে মানুষের জীবন সংগ্রামের ধরন হয়তো বদলাতে পারে, কিন্তু এই সংগ্রামের কোন বিরতি নেই। জীবন সংগ্রাম থেকে একটু অসচেতনভাবে বা অলসভাবে ঝিমিয়ে পড়লে সময় যেন হিংস্র হয়ে ওঠে। 'নিরুপম যাত্রা' নামক উপন্যাসের 'প্রভাত' এর মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন: "মেসে ফিরে এসে প্রভাত ঠিক করল আজই সে দেশে চলে যাবে। বাক্স-বিছানা গোছাতে গোছাতে প্রভাত ভাবল মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ সব, সময় আসে শকুনের মত উড়ে,...।" [দাশ, ২০১৭, ১ : ২৩৯] জীবনের স্বাদ-আহলাদ, আশা উল্লাস, আগ্রহ-অভিপ্রায় যেন সবই ক্ষণিকের। যা কিছু অনাবিস্কৃত, অপ্রাপ্ত, এবং যা কিছু আমাদের মোহাবৃত করে রাখে ঐ সবকিছুও চূড়ান্তভাবে মূল্যবান নয়। কারণ ওগুলোও পাওয়া হয়ে গেলে, বোঝা হয়ে গেলে বা আবিস্কৃত হয়ে গেলে যেন মূল্য হারায়। আমাদের পার্থিব জগতে বা জাগতিক জীবনের কোনখানেই যেন স্বস্তি নেই, স্থিতি নেই। জীবনটাকে তিনি 'দাঁড় কাকের বাসার মত ছন্নছাড়া' বিষয় বলেও মন্তব্য করেছেন। তাঁর 'নিরুপম যাত্রা' উপন্যাসের নায়ক তাই বলেন: "পৃথিবীর সাধারণ হাঁটা-চলার পথ তুচ্ছ খুঁটিনাটি যতদিন অনাবিস্কারের বিস্ময় কুয়াশা হয়ে থাকে, ততদিনই খুব গভীর লাভ– ধীরে ধীরে কল্পনা শুকিয়ে যায়– স্বপ্নগুলো যায় ভেঙ্গেচুরে– বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি– তৃপ্তি পাইনা, শান্তি পাই না, জীবনটা একটা দাঁড়কাকের বাসার মত ছন্নছাড়া জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; সকাল থেকে রাত্রি অব্দি একটা ক্ষুধিত কাকের মত সমস্ত রকম কার্যতা, চিত্তপ্রসাদহীন লালসা ও গ্লানির ভিতর নিবৃতি খুঁজে মরি, জীবনকে বুঝি জীবন ধারণ করে।" [দাশ, ২০১৭: ২৪০] জীবন সম্পর্কিত জীবনানন্দের এই বোধ অনেকটা অ্যাবসার্ডইম-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। পাশ্চাত্যের মতবাদ হিসেবে অ্যাবসার্ডইজম এমন একটি দার্শনিক মতবাদ যা জীবনকে স্বকীয়ভাবে অর্থবোধক বলে মনে করে না। জগত এমননি একটি স্থান যেখানে স্বকীয়ভাবে মানুষের জীবন কোনভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অর্থপূর্ণ নয়। অর্থ আবিস্কার করে নিতে হয়, তাও যে স্থায়ী– তেমন নিশ্চয়তা নেই। অ্যাবসার্ডইজমের প্রধান প্রবক্তা আলবেয়র ক্যামু (Albert Camus, 1913-1960) পার্থিব জীবনে ব্যক্তিমানুষকে আগন্তক (stranger) বলে আখ্যায়িত করেছেন। জীবনানন্দ তাঁর 'মাল্যবান' উপন্যাসে নায়িকা উৎপলার সাথে নায়ক মাল্যবানের সম্পর্কের নানারকম অবনতির চিত্র তুলে ধরেছেন। বাধ্য হয়েই এই উপন্যাসের নায়ক অনেকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এমনকি যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্ত্রীর সাথে তার পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র একেবারেই সংকুচিত হয়ে আসে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তার স্ত্রী উৎপলা অমরেশ নামক এক স্থুল ভোগবাদী প্রকৃতির মানুষের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও মাল্যবান ছিলেন নির্বিকার। বরং আরো একা হয়ে পড়েন তিনি।

জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতা, এমনকি, মৃত্যুর জন্য কামনারও একটি বড় কারণ ছিলো সমাজ-সভ্যতার সাথে ঘাপ খাইয়ে চলতে না পারা। তিনি বিপন্ন বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখেছেন পৃথিবীর নানারকম সংকট, জীবনের অর্থহীনতা। মানুষের স্বার্থপরতা, নির্লজ্জতা। জীবনের অনেক স্বাভাবিক গতির মধ্যে অস্বাভাবিকতা। তিনি নিজেকে কেন যেন এই পৃথিবীর জীব বলে ভাবতেও লজ্জা পাচ্ছেন। 'বনলতা সেন" কাব্যের বিখ্যাত কবিতা "অন্ধকার"– এ তিনি এই অভিব্যক্তি স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন। কবির ভাষায়:

কোনদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনদিন;
আমি অন্যকোন নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম চিন্তা, কাজ
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশ গ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি!

[দাশ, ২০১৫: ১৮৫]

আর এইরকম পৃথিবীতে তিনি তাই জেগে থাকতে চান না। বরং যতদিন ছিলেন সেই থাকার ক্ষত তিনি সারাতে চান। তিনি যেন অনেক দিন ধরে আত্মাকে বিরূপ বিষয়, কদাকার বিষয়, এমনকি ভয়াবহ বিষয় নিতে নিতে ক্লান্ত করে ফেলেছেন। এখন সেই আত্মার ঘুম দরকার– অনেক ঘুম। এবং এই ঘুম কোন মানব বসতিতে নয়। সভ্যতার অবদানে গঠিত কোন কৃত্রিম আবাসে ও আসবাবের শোভিত বিছানায় নয়, বরং নিরেট প্রকৃতির কোলে, যেমন ধানসিঁড়ি নদীর পারে। "অন্ধকার" কবিতায়ই তিনি বলেছেন:

ধানসিঁড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম– পউষের রাতে–
কোনদিন আর জাগব না জেনে
কোনদিন জাগব না আমি– কোনদিন জাগব না আর–
হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যাম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে,
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেল তীব্রতা তোমার নেই,

[দাশ, ২০১৫: ১৯৪]

যদিও ‘নীল কস্তুরী আভার চাঁদ’ ও রাতের সৌন্দর্য তাঁকে বাঁচবার ইন্দন যোগায়, তথাপিও দিনের আলোতে পৃথিবীময় যে অনাকাঙ্খিত ঘটনা, অমানুষিক কর্ম বয়ে চলছে তার কথা মনে করে তিনি ভীত হন। ভোরের আলোতে ঘুম ভাঙ্গার পরে তাই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন, এভাবে–

> অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
> হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উল্লাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
> ভয় পেয়েছি,
> পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা;
> দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে ওঠে
> মানষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখমুখি দাঁড়াবার জন্য
> আমাকে নির্দেশ দিয়েছে;
> আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়– বেদনায়- আক্রোশে ভরে গিয়েছে;
> সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
> উৎসব শুরু করেছে।
> হায়, উৎসব!
>
> [দাশ, ২০১৫: ১৮৪]

যান্ত্রিক সভ্যতার উগ্র-ভোগবাদী উৎসবকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। অধিকাংশ মানুষ যেখানে স্থুল ইন্দ্রিয়চারিতায় মগ্ন, সেখানে ‘মানষিক সৈনিক’ সেজে লড়াই করার সাহস হয়তো কোন বিপ্লবীর নিকট থেকে আশা করা যেত। কিন্তু রোমান্টিক ভাবধার উদ্বুদ্ধ কবির আত্মা না পারছে সেই বিদ্রোহ করতে, আবার না পারছে এই পাশবিকতার লড়াইয়ে নিজেকে যুক্ত করতে। তাই তিনি বরং নিরব প্রকৃতিতে একাকি আশ্রয় খুঁজেছেন, চেয়েছেন ঘুমাতে– অনাবিল অশেষ ঘুম। আসলে জীবনানন্দ চেয়েছিলেন মানবিক সুখ, যা ইতরপ্রাণির স্থুল সুখ থেকে পৃথক। মানবিক সুখ নৈতিকতা বিবর্জিত হতে পারে না। এই সুখ কেবল স্থুল দৈহিক বা বস্তুগত হওয়া সঙ্গত নয়। দার্শনিক জন স্টুয়ার্ড মিল যেমন বলেছিলেন: “It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool, or the pig, is of a different opinion, it is only because they only know their own side of the question" (Mill, 1863: 67)।

আঠারোশ’ শতাব্দির শ্রেষ্ঠতম ভাবুকে জাঁ, জ্যাঁক রুশো [Jean Jacques Rousseau 1712-1778] বিজ্ঞান-প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ নিয়ে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন জীবনানন্দের সময়ে এসে তারই বাস্তব ফল আমরা দেখতে পাই। ১৭৫০ সালে Academy of Dijon কর্তৃক আয়োজিত উন্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন এই ফরাসী ভাবুক। ‘A Discourse on the Sciences and Arts’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যা ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। এ প্রবন্ধের মূল দাবীর

অন্যতম দিক ছিলো এই যে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ব্যাপক ও বাছবিচারহীন প্রবৃদ্ধি আমাদের নৈতিক চরিত্র ও মূল্যবোধের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এবং এর ফলে দুর্নীতিও যাবে বেড়ে। ফলে মানবসমাজে বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রেও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে। জীবনানন্দ দাশও মনে করতেন যে, মেশিনের উৎকর্ষের সাথে মানুষের মনের শুদ্ধতাও অধিক মাত্রায় প্রয়োজন। মানুষের হৃদয়কে সত্যিকারভাবে জাগাতে না পারলে যন্ত্রের জয়-যাত্রা মানবসমাজকে আরো বেশি বিশৃঙ্খল করে ফেলবে। "জনান্তিকে" কবিতায় তিনি বলেন:

মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি, অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কী করে চেনাতে পারে কেউ।
চারিদিকে অগনন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খলা।"

[দাশ, ২০১৫: ২৬৪]

যে মানবসমাজ কেবল বস্তুগত সম্পত্তি ও যান্ত্রিকতার অগ্রগতি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগী হয় এবং যার ফলে মানবসমাজে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলতা সেই সমাজে কোন নৈতিক চেতনার যথাযোগ্য উন্নতি হয় না। জীবনানন্দ মনে করতেন যে, এমন বিশৃঙ্খল সমাজে মানুষের প্রকৃতির কাছে গিয়ে তার নিবিড় ছোঁয়া অনুভবের সুযোগও থাকে না। আমরা জানি, জীবনানন্দ তাঁর নিঃসঙ্গতার কষ্ট এড়ানোর জন্য প্রকৃতির কাছে নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও তার উপলব্ধি বলে: "অধিক গভীরভাবে মানবজীবন ভালো হলে/ অধিক নিবিড়তরভাবে প্রকৃতিকে অনুভব/ করা যায়।" [দাশ, ২০১৫: ২৯০]

চার

জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতার চেতনা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যাপনের বাস্তবতার দ্বারাও উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে করা যায়। তিনি জন্মেছিলেন বরিশালের এক বিশেষ হিন্দু পরিবারে। তৎকালীন সমাজের খুব কম সংখ্যক হিন্দু পরিবার ব্রহ্ম-সমাজের অনুসারী ছিলো। জীবনানন্দের পরিবার ছিলো তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর পিতামহ সর্বানন্দ দাশ মূলত বিক্রমপুরের বাসিন্দা ছিলেন। প্রমত্তা পদ্মার শাখা নদী কীর্তিনাশা'র তীরে ছিলো তাঁর বসবাস। [সিলি. ২০২০: ২১] সেখানে তাদের পূর্ব পুরুষের অনেকটা জমিদারী ছিলো। কিন্তু পরিবারের পূর্বপুরুষদের অবহেলা, নদী ভাঙ্গন, দস্যুদের উৎপাত ইত্যাদি নানাবিধ কারণে তাদের পারিবারিক সম্পত্তির অনেকাংশই ধ্বংস হয়। [সিলি, ২০২০: ২২] এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর পিতামহ তাদের

পৈত্তিক আবাস ছেড়ে বরিশালে চলে আসেন। বরিশালে এসেও তাদের বাড়ী বদলের পালা চলে অনেকবার। এ সম্পর্কে জীবনানন্দের একজন অন্যতম প্রধান জীবনীকার প্রভাত কুমার দাস বলেন: 'বরিশাল শহরে যে বাড়িতে জীবনানন্দের জন্ম, সেটি ছিলো আটচালা ঘর। জীবনানন্দের দাদা সর্বানন্দ দাশ সেই বাড়িতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বাড়িতে থাকা অবস্থায় ১৮৯৪ সালে সত্যানন্দ দাশ ও কুসুম কুমারীর বিয়ে হয় এবং ৪ বছর পরে তাদের প্রথম সন্তান জীবনানন্দ দাশের জন্ম হয়। কিন্তু জীবনানন্দের দাদা সর্বানন্দের পুত্ররা অর্থাৎ তাঁর বাবা কাকারা এই বাড়িটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এর পরে তারা আলেকান্দা এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে পত্নী মুক্তকেশী গুপ্তার বসতবাড়ির এক অংশে অনুমতি সূত্রে জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ দাশ, কাকা হরিচরণ দাশসহ অন্য কাকারা মিলে একটি ঘর নির্মাণ করেন। তবে মালিকানা বদল নিয়ে সে বাড়িটি নিয়েও বিপত্তি বাঁধে। ফলে সম্পূর্ণ নিজ মালিকানাধীন একটি বাড়ির জন্য হরিচরণ ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। মূলত তাঁরই একাগ্র অন্বেষণ ও উৎসাহে অন্য ভাইদের সহায়তায় শহরের বগুড়া রোডে ১৯০৭ সালে, অর্থাৎ জীবনানন্দের বয়স যখন ৮ বছর, তখন তারা একটি ঘর নির্মাণ করেন। সর্বানন্দের নামানুসারে বাড়িটির নাম রাখা হয় 'সর্বানন্দ দাশ।' [রশীদ, ২০২১: ১৬-১৭]

এ পর্যন্ত বর্ণনায় বোঝা যাচ্ছে যে, জীবনানন্দের পরিবার তাদের স্থায়ী বসতি নিয়ে সংকটে ছিলেন। তবে জীবনানন্দ নিজে এই সংকট হয়তো খুব একটা উপলব্ধি না করলেও তার পারিবারিক এই অবস্থা ছোটবেলা তিনি কিছুটা হলেও ধারণা করতে পেরেছেন। তার চেয়ে বড় কথা হলো তার পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে এক ধরনের জন্মস্থান বা বসতিগত দিক থেকে নিজেদের মননে কিছুটা হলেও সংকোচবোধ ছিলো। কোন একটি স্থানে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় বসবাস করলে পারিবারিকভাবে যে জোর বা মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় সেই অবস্থা জীবনানন্দের নিকট পরিজনের হয়তো ছিলো না। আর তার সাথে যদি ব্রাহ্মধর্মের বিষয়টি যোগ করা হয়, তাহলে এই সামাজিক ক্ষমতা ও বহুজনের সাথে অনৈক্যের চেতনা অনেকটাই স্পষ্ট হবে। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হিসেবে তাঁদের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে এবং সেখানে বিচ্ছিন্নতাবোধ বা নিঃসঙ্গতার যোগসূত্র নির্ণয় করতে গিয়ে যতীন সরকার বলেন:

> "সরল জীবন ও উচ্চচিন্তাই ছিল ব্রাহ্মদের জীবনাদর্শ। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যের কাজ করতেন; পেশায় ছিলেন স্কুল শিক্ষক, ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা ব্রাহ্মবাদীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, প্রবন্ধ লেখক। মাতা কুসুম কুমারীও ছিলেন কবি। বরিশালের মতো মফস্বল শহরে গুটিকয়েক ব্রাহ্ম পরিবার নিয়েই ছিল তাঁদের সমাজ। ব্রাহ্মদের বলা হয় 'আলোকিত হিন্দু' (Enlightened Hindu), সাধারণ হিন্দু সমাজ থেকে তাদের দূরত্ব ছিল বিস্তর, অন্তত জীবনানন্দ

> দাশের শৈশবকালের জিলা শহর বরিশালে তো ছিলই। সে সময়েও শহরের শিক্ষিত হিন্দুরাও জাতপাত ভেদমূলক আচারের দেয়াল পুরোপুরি ভেঙ্গে দিয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন না। এবং বৃহত্তর সমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকেই বরিশালের ব্রাহ্মরাও নিজেদের একটি পরিমণ্ডল গড়ে নিয়েছিলেন, সে পরিমণ্ডলেই চলতো তাঁদের মনন ও বৈদগ্ধ্যমণ্ডিত বিশিষ্ট জীবনচর্যা। এ রকম জীবনচর্চার মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মিক বিচ্ছিন্নতা ঘোচানোর প্রয়াস পেতেন। সেই জীবনচর্যার উত্তরাধিকার নিয়েই জীবনানন্দের জন্ম হয়েছিল" (চৌধুরী, ২০০০: ৫০-৫১)।

বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ সম্পর্কে বলতেন, "অবগুণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব", কেউ কেউ তাঁকে 'নির্জনতার কবি" বলেও চিহ্নিত করেন। এ ধরনের ব্যক্তিত্বের বীজ এই সমাজব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজতে হবে (চৌধুরী, ২০০০, পৃ. ৫১)।

১৯১৭ সালে বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে আই.এ পাশ করে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজি সাহিত্যে পড়ালেখা শেষ করে তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন থাকতে পারেন নি। এর পরে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজ, বাগেরহাটের পি.সি. কলেজ ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। এর মধ্যে বেশ কিছুদিন, বিশেষকরে, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ একটানা পাঁচ বছর বেকার জীবনের স্বাদ গ্রহণ করেন (রশীদ, ২০২১: ৭৮) । কিছুদিন পত্রিকায়ও কাজ করেন (স্বরাজ' পত্রিকা)। এবং রামযশ কলেজ, দিল্লী (১৯২৯-৩০), বরিশাল কলেজ, কলকাতা (১৯৫২-৫৩), খড়গপুর কলেজ, পশ্চিম মেদিনীপুর (১৯৫০-৫১), হাওড়া গার্লস কলেজ (১৯৫৩-৫৪) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানেও চাকরি করেন। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের কোনটিতেই তিনি দু'চার মাসের বেশি থাকেননি, বছর গড়াতে পারেননি। কেবল তাঁর জন্মভূমি বরিশালে বি. এম. কলেজেই তিনি ১১ বছর (১৯৩৫-১৯৪৬) চাকরি করেছেন।

দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৮ সালে জীবনানন্দ পাকাপাকিভাবে বরিশাল ছেড়ে কলিকাতা চলে গেলেন। কিন্তু জীবনের শেষ অবধি তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে নিজ সত্তাকে যেন সপে দিতে পারেন নি। বরিশালের প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষ ও সমাজ তাঁকে একান্তভাবে টেনেছে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি ফিরে আসতে চেয়েছেন ধানসিঁড়ি'র তীরে, ঘুমাতে চেয়েছেন তাঁর জন্মভূমি আবাহমান বাংলার প্রকৃতির কোলে। কিন্তু এই প্রকৃতিও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে চলে, তাঁর সময়ের কলিকাতাও অনেকটা বদলে গিয়ে তথাকথিত 'তীলত্তমা' হয়ে উঠছিলো। এসব পরিবর্তনের মাঝে তিনি বাংলার ঐতিহ্যবাহী শ্যামল ছায়াকে দারুণভাবে অনুভব করতেন, কষ্ট পেতেন। বাংলার সেই আবহমান নীলিমা যেন হাড়িয়ে যাচ্ছে, যান্ত্রিক সভ্যতার বস্তুগত উন্নতিতে

মানুষ অনেকটা অবিবেচকের মতোই হয়তো প্রকৃতির ওপর অশুভ প্রভাব ফেলছে। এই বোধ থেকে তিনি তথাকথিত সভ্য-লোকের সমাজে দালান-কোঠা ঘেরা পরিবেশে থেকেও অসংখ্য মানুষের ভীরে থেকেও মনের দিক থেকে একাকিত্ব বোধ করতেন। বাংলার প্রকৃতি থেকে তার শারীরিকভাবে বিচ্ছিন্নতা, এবং ক্রমশ এই শ্যামল বাংলার নির্মল নীলিমা নিঃশেষ হবার ভয় থেকে তিনি অনেকগুলো প্রকৃতি প্রেমি, দেশপ্রেমি কবিতা লিখে ফেললেন। বরিশাল থাকাকালীন ৩০ দশকের দিকে তিনি কবিতাগুলো লিখে তাঁর সম্পদশালা অর্থাৎ ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বরিশাল ছেরে যাওয়ার সময় ঐ সম্পদশালা তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার প্রকৃতি নিয়ে লেখা ঐ পাণ্ডুলিপির তিনি নাম দিয়েছিলেন "বাংলার ত্রস্ত নীলিমা" (গুহ, ২০১৮: ৮৯)। এই পাণ্ডুলিপি থেকেই তাঁর মৃত্যুর পরে জীবনানন্দের ছোট বোন সুচরিতা দাশ, ভাই অশোকানন্দ দাশ, এবং বিশেষকরে ভূমেন্দ্র গুহের তৎপরতায় ১৯৫৭ সালে 'রূপসী বাংলা" নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ করে 'সিগনেট প্রেস", আর "বাংলার ত্রস্ত নীলিকা" নামটির পরিবর্তে "রূপসী বাংলা" নামটি দেন সিগনেট প্রেসের কর্ণধর দিলীপকুমার গুপ্ত (গুহ, ২০১৮: ৯০-৯৩)। সে যাইহোক, ডি. কে. গুপ্ত "বাংলার ত্রস্ত নীলিকা" নামটি গুপ্ত করে দিলেও জীবনানন্দের মূলভাব যে ঐ নীলিমা'র প্রেম তা কিন্তু বিলুপ্ত হয়নি।

১৯৩০-এর ৯মে জীবনানন্দ দাশ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ইডেন কলেজে পড়া লাবণ্য নামক এক তরুণীর সাথে। বিয়েটা পারিবারিকভাবেই হয়েছে। অনেকটা বেকার জীবনের এবং রক্ষণশীল পরিবারের বাস্তবতায়। তাঁর পছন্দের পাত্রী অর্থাৎ তাঁর খুরততো বোন বেবি, যাকে নিয়ে তিনি ডায়রিতে ÔYÕ এর সংকেতে অনেককিছু লিখতেন, তার সাথে বিয়ে হলো না। এমনকি, ঘটনা আরও নাটকীয়তা পায় তখন যখন বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেমিকা (শাহাদুজ্জামান, ২০২২: ৭১-৭২)। প্রেম ঘটিত এই শূন্যতা অনেকটা লাঘব হতে পারতো যদি তাঁর স্ত্রী হতো সত্যিকারের সহযোগী জীবন সঙ্গী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবসত তা হয়নি। বাংলার এক সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠা এবং দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত লাবণ্যও একরকম শহুরে জীবনের উচ্চবিত্ত সংস্কৃতির প্রতি লালায়িত নিতান্ত ভোগবাদী চরিত্রের ছিলেন। অর্থাৎ বিয়েটা তাঁর মনের মতো হলো না। হলো না সত্যিকারের সংসার করা। এই নিয়ে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক হতাশায় ভুগতেন। ১৬.১২.১৯৩৩ তারিখে জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখেছেন, "Our marriage is scrap" (দাস, ১৯৯৯: ১৪৪)। এ সময়কার সাহিত্যকর্মে জীবনানন্দের দাম্পত্য সম্পর্কজনিত নিঃসঙ্গতার চেতনা প্রকাশিত হয়েছে নানাভাবে। ৩০ এর দশকে লেখা 'সুতীর্থ' উপন্যাসের নায়িকা শাচী এবং নায়ক সোমেন-এর কথোপকথনের মধ্যে আমরা এই নিঃসঙ্গতা ঢাকবার প্রয়াস লক্ষ করি।

> "শচী অনেকক্ষণ পরে বললে, 'চলনা, পাড়াগাঁয় যাই'–
>
> 'কোন পাড়াগাঁয়?'

'যেখানে ছিলাম আমরা'–
'সেই বকমোহনার নদীর ধারে? ভাঁটশ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?'
শচী মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যা-সেখানেও'–
সোমেন বললে 'অসম্ভব'।
'অনেকদিন আমি ভেবেছি, যাব–'
সোমেন মাথা নেড়ে বললে, কী করে যাবে?'
শচী আনত মাথায় ভাবছিল।
একটু পরে মুখ তুলে বললে, 'কেন?'
সোমেন বললে, 'তুমি আবার ফিরে আসতে চাইবে যে–'
'ফিরে আসব না কেন?'
চুরুটটা সোমেনের শ্লথ আঙ্গুলের ভিতর ঢিলে হয়ে যাচ্ছিল; সেটাকে শক্ত করে চেপে ধ'রে বললে,
'কেন ফিরে আসবে?'
'কেন আসব না'
সোমেন বললে, 'তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল'
বনধুঁধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতরে গেলে
আমিতো আর ফিরে আসতে পারবো না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যা ছিলাম আমরা, তা নেই আমরা–
'সে আমিও নেই, তুমিও নেই।' "
(সিলি, ২০২০: ১০৪-১০৫)

পাঁচ

জীবননান্দ দাশ আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর সাহিত্যিক স্টাইল, চিন্তার ধরন বা বোধশক্তি, জীবন ও জগত সম্পর্কিত মনোভাব, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছু নিয়েই তিনি লক্ষণীয়ভাবে নিঃসঙ্গ। এই প্রবন্ধে তাঁর এই বহুমাত্রিক নিঃসঙ্গতার প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ অনুসন্ধানে যা উঠে এসেছে তার সংক্ষিপ্ত সার ও মূল্যমানের বিচারমূলক মন্তব্য এ পর্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

জীবনানন্দের সাহিত্য, বিশেষকরে, তাঁর কবিতা বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্টতার দাবীদার। এটা অনেকটা স্বীকৃত একটি বিষয় হিসেবেই আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্র প্রভাব বলয়ের বাইরে গিয়ে তিনি সাহিত্যে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কবিতার ভাব, গঠন, শব্দ প্রয়োগ বিষয়বস্তু ইত্যাদি অনেক দিক দিয়ে তাঁর অনেক কবিতার মধ্যে বেশ স্বাতন্ত্র ধরা পড়ে। এই স্বাতন্ত্রের বিষয়টি চিহ্নিত করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়, কেননা এটা অনেকটা প্রতিষ্ঠিত বিষয়। বর্তমান অনুসন্ধানে যে বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে তা হলো স্বাতন্ত্র বা নিঃসঙ্গতার কারণ কী। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কারণগুলোর প্রথমটিতে আমরা দেখেছি যে, বোধ-এর দিক থেকে

তিনি অনেকটাই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর বোধ একটু অন্যরকম ছিলো, সেই অন্যরকমের নৈতিক ও প্রায়োগিক মান যাহোক না কেন তা অনেকটা স্বাতন্ত্র ছিলো– এটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তিনি নিজেও। তাঁর এই স্বতন্ত্র বোধ এর সাথে সমকালীন ইউরোপীয় চিন্তকদের মধ্যে নীট্শে, কিয়ার্কেগার্দ প্রমূখের নাম উল্লেখ করা চলে। এর দ্বারা একথা বলা হচ্ছে না যে, জীবনানন্দের চিন্তার সাথে তাঁদের চিন্তার অনেক মিল ছিলো। মিল কোথাও কোথাও ছিলো বটে, তবে নিঃসঙ্গতার বাস্তবতা বা কারণ এঁদের মধ্যে অনেকটা অভিন্ন। নীট্শে, কিয়ার্কেগার্দ যেমন তাদের সময় ও সমাজে উল্টো পথে হেঁটেছেন, ভিন্ন রকমভাবে চিন্তা করে সমাজে অনেকের থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন, তেমনি জীবনানন্দও তাঁর সমাজ ও সময়ে ভিন্নরকম বোধের ধারক যার কারণে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন।

জীবনানন্দের নিঃসঙ্গতাকে অস্তিত্ববাদী চেতনাগত নিঃসঙ্গতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। অস্তিত্ববাদী দর্শন ব্যক্তিবাদী ভাবধারার ধারক। এ ভাবধারা অনুযায়ী সার্বিক সত্য, সার্বিকতত্ত্ব, সার্বিক সূত্র এগুলোর প্রয়োগ ব্যক্তিজীবনে সার্বিকভাবে কাম্য নয়। জীবনানন্দ তাঁর ব্যক্তিচিন্তাকে কোন সার্বিক তত্ত্বের বা মতাদর্শের আলোকে পুরোপুরি পরিচালিত করেননি। এমনকি, কোন সাহিত্যিক বা তাত্ত্বিক সংঘের শ্রেণিভূক্ত ছিলেন না তিনি ব্যক্তিজীবনেও। অস্তিত্ববাদ নামক পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক ভাবনার সাথে তাঁর ভাবনার অনেক দিক থেকে মিল থাকলেও তিনি নিজেকে অস্তিত্ববাদী বলে দাবী করেননি। আর তাঁর যে অস্তিত্ববাদী ভাবনা এটা ঠিক পাশ্চাত্য ভাবনার মতোও পুরোপুরি নয়। এই প্রবন্ধে তাঁর অস্তিত্ববাদী ভাবনাকে নান্দনিক অস্তিত্ববাদ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

জীবনের প্রতি জীবনানন্দ বেশ নেতিবাচক ধারণা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে তা দেখানোর চেষ্টাও করা হয়েছে। তাঁর এই নেতিবাচক চেতনা, তাঁর নিঃসঙ্গতা তথা সমাজ, দল, ও সংঘ থেকে নিজেকে একটু গুটিয়ে চলার কারণও এর মধ্যে অনেকটা নিহিত ছিল। জীবনানন্দের সমসাময়িক সমাজ তথা বিশ্ব-পরিবেশ তিনি যেভাবে দেখেছেন তারই ফলস্বরূপ তাঁর এই মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। পুঁজিবাদী সমাজের উগ্রভোগবাদী মানসিকতাকে তিনি মেনে নিতে পারেননি। আর এই ভোগবাদী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানবসমাজের যে নৈতিক মান তা ক্রমশ নিম্নগামী হতে দেখেছেন তিনি। 'সুচেতনা-কে তিনি দূরতর দ্বীপ' বলেও মনে করতে বাধ্য হয়েছেন।

একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক, পারিবারিক অবস্থা, বংশ-গোত্র, সম্প্রদায়ও মানুষের চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রতিটি বিষয়ের মধ্যদিয়েই একজন ব্যক্তিমানুষ তার নিজের বোধ গঠন করে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমে ব্যর্থতা, দাম্পত্য জীবনের অশান্তি, আবাসভূমি সংক্রান্ত জটিলতা, পেশাগত জীবনের স্থিতিহীনতা

ইত্যাদিও জীবনানন্দ দাশের নিঃসঙ্গতার চেতনার পেছনে ইন্দন হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করা যায়।

তথ্যসূত্র

Aristotle, 2000. *Nicomachean Ethics,* Translated by Roger Crisp, Cambridge University Press

Russell, Bertrand, 1996. *History of Western Philosophy,* Rontledge, London, Second edition (Reprcinted)

Russell, Bertrand, 1993. *An Outline of Philosophy,* Routledge, London, Reprcinted

Thilly, Frank, 1973. *History of Philosophy,* Central Book Depot, Allahabad, India

Heidegger, 1956. *Exstence and Being,* Intro. by Werner Brock, Vison Press Ltd. London

Kant, Immanuel, 1934. *The Funfamental Principles of the Metaphysic of Ethics,* Translated by Otto Manthey Zorn, D. Apploton-Century Company, New Yourk

Sartre, Jean-Paul, 1957. *Being and Nothingness,* Trans by Hazel E. Banrness, Methuen and Com. Ltd. London

Mill, John Stnart, 1863. *Utililarinism*, Parker, London

Warnock, Mary, 1985. *Exstentialism*, Oxford University Press, Oxford, Reprcinted

Plato, 1992. *Republic,* Transtated by: G.M.A. Grube, Haekett Pub. Co. Indiana

রশীদ, আমীন আল, ২০২১. *জীবনানন্দের মানচিত্র*, ঐতিহ্য, ঢাকা

সিলি, ক্লিন্টন বি ২০২০., *অনন্য জীবনানন্দ*, প্রথমা প্রকাশনা, ঢাকা

দাশ, জীবননান্দ, ২০১৫. *কবিতাসমগ্র,* সালাউদ্দিন বইঘর, ঢাকা

দাশ, জীবননান্দ, ২০১৭. *কবিতার কথা,* সম্পাদনাঃ ফয়জুল লতিফ চৌধুরী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

দাশ, জীবনানন্দ, ২০১৭. *উপন্যাস সমগ্র*, সালাউদ্দিন বইঘর, ঢাকা

চৌধুরী, ফয়জুল লতিফ, ২০০০. *জীবনানন্দ বিবেচনা*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা

গুহ, ভূমেন্দ্র, ২০১৮. *আলেখ্যঃ জীবনানন্দ*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

চক্রবর্তী, সুমিতা, ২০০১. *জীবনানন্দঃ সমাজ ও সমকাল*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

শাহাদুজ্জামান, ২০১৮. দেখুনঃ মাসউদ আহমাদ, সম্পাদিত, *জীবনানন্দ*, (জীবনান্দ-চর্চা পত্রিকা), ১ম সংখ্যা, অক্টোবর, ঢাকা

শাহাদুজ্জামান, ২০২২. *একজন কমলালেবু*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা

[Abstract: Jibanananda Dash (1899-1954) is considered the poet apart in the history of Bangla literature. His poetic style, words, metaphor, and objects used in his literary works are mostly unique in several viewpoints. Throughout his lifetime his literary works were not properly valued mainly because, for two reasons, these are: on the one hand, his unique approach was not widely understood in the then Bengali society, even in the literary community; on the other hand, the poet himself was very reluctant to attain publicity, for instance, he basketed most of his unpublished writings which are being unearthed nowadays as posthumous. His recently unmasked works consist of a huge amount of poems, short stories, and also some invaluable novels. It is a matter of fact that the personality of an artist naturally influences his works of art. In his literary works, we found the notion of solitude. Having had many of his posthumous, the discussion on Jibanananda has turned into different attention from literary critics and other scholars. This paper aims to explore the notion of solitude and also intends to bring out the philosophical link to it. Throughout the discussion, there is an endeavor to reveal that Jibonananda's notion of solitude is not merely an accidental or unstable case, rather it is a continuous aspect triggered by some of his philosophical perspectives that are partly similar to existentialism, absurdism, and some others contemporary thought. The psychological aspect developed from his personal experience of his life's way also influenced him to embrace this solitude.]